প্রাচীন রাজস্থানি দোঁহার বৈচিত্র্যময় রুপরেখা

জ্যোতির্ময় দাশ

আমাকে তণ্ডুল উদ্ধারের প্রয়োজনে একসময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থায়ী ভাবে হলেও দীর্ঘকাল প্রায় স্থিতু হয়ে কাটাতে হয়েছো। যেমন দিল্লি, জয়পুর, পাটনা এবং রাঁচিতে। যখন যেখানে থেকেছি সে সময়ে সেদেশের আঞ্চলিক ভাষা শেখার এবং সাহিত্যের অনুসন্ধান করে বেড়ানেটা আমার প্রায় নেশা হয়ে উঠে ছিল। এর মধ্যে জয়পুরে (রাজস্থান) থাকতে প্রায় ষোলো (১৯৬৪-৭৯) বছরের কিছু বেশি সময়। সে সময়ে প্রাচীন রাজস্থান কিছু দোঁহা পড়ার সুযোগ হয়। আমি সেগুলো পড়ে মুগ্ধতায়। আমি পরবতী প্রায় তেরো বছর নিরন্তর অনূসন্ধানে ছশোর ও কিছু বেশি দোঁহা সংগ্রহ করি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, প্রাচীন গ্রন্থ এবং রাজস্থানের কিছু প্রবীণ মানুষের ,স্মৃতির সঞ্চয় থেকো।

দোঁহা প্রধানত হল দু-ছত্রের ছন্দবদ্ধ এক ধরনের চারণ কবিতা। গ্রামে গঞ্জে চারণ কবিরা মুখে মুখে দোঁহা রচনা করে মাধুকরী (বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতো) জীবিকা নির্বাহকরত। এই চারণকবিদের অধিকাংশই প্রাতিন্ঠানিক পড়াশুনো থেকে বঞ্চিত এবং নিরক্ষর ছিল এবং তাদের মুখে মুখে রচিত দোঁহাগুলি শ্রুতি ও ,স্মতিতে পরিবাহিত হয়ে বংশপরম্পরাযু চলে এসেছে। লোকমুখে প্রচলিত বহু প্রাচীন দোঁহা বর্তমানে প্রবাদে পরিণত হয়েছো। তাছাড়া বহু প্রাচীন লৌকিক দেবদেবী, ব্রতআচার, সংস্কার এবং স্থানীয় বীর নায়কদের কীর্তি কাহিনী দোঁহায় গ্রন্থিত হবার কারণে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এইসব দোঁহাকে আমরা একধারে লৌকিক সাহিত্য (লোকসাহিত্য- ফোক-লোর) এবং মৌখিক সাহিত্য (লিখিত নয়- ওরাল লিটারেচার) বলতে পারি। এই প্রতিবেদন আলোচিত দোঁহাগুলি আড়াইশো থেকে চারশো বছর আগে রচিত হয়েছো। অথচ আজ এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞাননির্ভর যুগেও তা ভয়ংকরভাবে প্রাসঙ্গিক। যেমন নীচের দোঁহাটির মূল ভাব সেকালেও যেমন গ্রহণীয় ছিল আজও তা তেমনই আছে।

নাঁও রহ্নদা ঠাকরাঁ, নাঁণা নায়রহন্দ।
কীরত হন্দা কোটড়া, পাড্যা নাঁহি পড়ন্দা।।

সহজ এবং সরল গদ্য অনুবাদে যার অর্থহল- অর্থ থাকে না কিন্তু যশ থেকে যায়, ও খ্যাতির দুর্গ চেষ্টা করলেও ধ্বংস করা সম্ভব নয়া।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাজস্থানি দোঁহা রূপক ও প্রতীকী বর্ণনায় অনেক সময়েই দ্ব্যর্থভাব বহন করে। তই দাঁহার যথাযথ ভাষান্তর করা খুবই জটিল এবং রাজস্থানি ভাষার গঠনরীতি, ব্যাকরণ এবং ছন্দ রক্ষা করে দোঁহাগুলিকে ছন্দে অনুবাদ করা প্রায় অসন্তব। সেকারণে দোঁহার

অন্তর্নিহিত মাধুর্যটি রসগ্রাহী পাঠকদের উপভোগের জন্য এখানে দোঁহার মুল ভাবার্থটিকে সহজ গধ্য-রূপান্তরে প্রকাশ করা হলো।

আমার সংগৃহীত সেই ছশো (৬০০) দোঁহাকে আমি বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন করেছিলাম। যেকোনো প্রসঙ্গে এই বিষয়ের ন্যূনতম কুড়িটি দোঁহার সন্ধান পেলেই আমি সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেছি। এখানে শ্রেণীবিভাজনের শিরোনাম এবং প্রত্যেক বিভাগের একটি করে মাত্র দোঁহা উদাহরণ হিসেবে দিলাম নিবন্ধের আয়তনের কথা মাথায় রেখো। শ্রেণীবিভাজনগুলি এই ধরনের ছিল :

এক। বীররস ও বীরত্ব-বিষয়ক দোঁহা-
রাজস্থানি জনজীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল তার স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং তার বীরত্ব । এই দুটি ভাবধারই প্রাচীন রাজস্থানি সাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। সব সম্প্রদায়েই বয়োজ্যেষ্ঠরা সন্তানসম্ভনা মায়েদের গর্ভকালে ও প্রসবপূর্বসময়ে নানা ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকেন। রাজস্থানের এক প্রবীণা কোনো গর্ভবতী তরুণীকে কী ধরনেরু উপদেশ দিয়ে থাকে তার নমুণা-

তরুণী জনৈ কপুত মত, চঙ্গো- জোবন খোয়।
জণৈ তো বৈর বিহগুণো, কে কূল মণ্ডন হোয়া।

হে তরুণী, কূপুত্রের জম্ম দিয়ে নিজের এই সুন্দর যৌবন নষ্ট কোরো না- যদি জম্মই দিতে হয় তো বীরের জন্ম দিয়ো যে তোমার শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবে অথবা বংশের মূখ উজ্জ্বল করবে।

দুই । বীরাঙ্গনা ও কাপূরুষতা-বিষয়ক দোঁহা-
পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে জীবনে যারা মহৎ এবং বরণীয় হয়েছো তাঁদের কৃতিত্ব ও চারিত্রিক দুঢ়তার পেছনে নিঃশব্দে অনুপ্রেরণার কারণ ছিলেন কোনো একজন মহীয়সী রমণী- তিনি প্রেয়সী, ভার্যা অথবা ক্ষণিকের বান্ধবীও হতে পারেন। পুরুষের শৌর্য ও বীর্যের পেছনে রমণীর পরোক্ষ অবদান অপরিসীম। এদেশের দোঁহায় রমণীর এই নেপথ্য ভূমিকার স্বীকৃতির সঙ্গে বীরাঙ্গনা ণারীর কোমল হীদয়ের নিভৃতে যে বজ্রকঠোর শক্তি আছে তার গুণগাণ শোণা যায়।

সমর চঢ়ে কাঠাঁ চঢ়ে, রহৈ পীব রৈ সাথ।
এক গুণা নর সুরমা, তিনগুণ গুণা তিয় জাত।

(বীরত্বই হল বীরপুরুষের একমাত্র গুণ, কিন্ত বীর রমণীর মধ্যে তিনটি গুণের মিলন দেখা যায-সে যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করতে পারে, স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণে সতী হয় এবং আমরণ স্বামীর জীবনসঙ্গিনীর দায়িত্ব পালন করে।)

আর আঘাত ও মৃত্যুর ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা কাপুরুষ স্বামীর প্রতি বীর পত্নীর কণ্ঠে যে শ্লেষ ও ছিছিক্কাব শোনা যায় তার চিত্রটি এই ধরনের :

কন্ত ঘর কিম আরিয়া, তেগা রী ঘণ তাস।
লহঙ্গৈ মুঝ লুকীজিয়ে, বৈরী রো ন বিসাস।

(হে প্রিয়, তরোয়ালের আঘাতের ভয়ে তুমি এ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে পারলে কী করে? কিন্তু শত্রুকে বিশ্বাস নেই, সে হয়তো তোমার খোঁজে এখানে এসে পৌছতে পারে । তাই আমি বলি কী, তুমি আমার শাড়ির আচলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ো ।

৩। যুদ্ধের বাহন, অস্ত্র এবং গোঁফের স্তুতি-

মানব সভ্যতার বিকাশের প্রায় শুরু থেকেই যে পশুটি আমাদের বন্ধু সহচর ও বাহন হিসেবে সঙ্গ দিয়ে এসেছে সেই ঘোড়াকে নিয়ে অন্য ভাষায় সাহিত্য কিছু না থাকলেও রাজস্থানের চারণ কবিরা বহু দোঁহা রচনা করেছে। রাজপুত বীরের কাছে ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা কেমন ছিল সেকালে?

জনম অকারথ হী গয়ো- ভর ফির খগ্গ ন ভগ্গ।
তীখা তূরী ন যাণিয়ো- গোরী গলে ন লগ্গ।

(যুদ্ধে যদি শত্রুর মাথায় তরোয়ালের আঘাত না করতে পারলাম, তেজি ঘোড়ার পিঠে না চড়লাম, গৌরাঙ্গী রমণীকে আলিঙ্গন না করলাম তো জীবন মূল্যহীন ব্যর্থ।

৪। প্রসিদ্ধ নায়ক ও নায়িকা স্মরণে দোঁহা-

রাজপুতানায় (বর্তমানে রাজস্থান) ছোটো বড়ো বহু করদ রাজা আলাদা অলাদা সার্বভৌমত্ব নিয়ে রাজত্ব করতেন । তাদের নিজেদের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক যুদ্ধ ছাড়াও বহিঃশত্রু হিসেবে মুঘল ও মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে রাজপুতদের বার বার অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছো। দোঁহা সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে এই যুদ্ধ কাহিনী এবং যুদ্ধনায়কদের গাথা।

আকবর জাসী আপ, দিল্লী পাসী দুসরা।
পনরাসী পরতাপ, সুজন ন জাসী সুরমা।

(আকবর স্বয়ং নিশ্চিহ্ন হয়ে যারে এবং দিল্লি অন্য শাসকদের আধিপত্যে চলে যাবে একদিন, কিন্ত হে পুণ্যবান বীর (রাণা) প্রতাপ, তোমার সুযশ কখনো শেষ হয়ে যাবে না।)

৫। প্রেম ও বিরহ-বিষয়ক দোঁহা-

রাজস্থানি দোঁহায় প্রেম ও বিরহের এক বিপুল সম্ভার আছে। আর প্রেমের সঙ্গে বিভিন্ন ঋতুর একটি নিবিড় যোগসূত্র বিদ্যমান । গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ বাতাবরণ থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দেয় বর্ষার শীতল জলধারা। রাজস্থানে বর্যা বিশেষ প্রিয় ঋতু। প্রবাসী স্বামীরা এ সময়ে ঘরে ফিরে আস। বর্ষা ঋতু এসেছে অথচ স্বামী প্রবাস থেকে তখনও আসেনি, সে অবস্থায় এক বিরহিণীর বিলাপ এই ধরনের :

নালা নদিয়া সূঁ মিলৈ, নদিয়া সরোবর জ্যায়।
বিরছাঁসূঁ বেলা মিলৈ, এ্যাসী সহী ন জ্যায়।।

(ছোটো ঝরনা নদীতে এসে মিলেছে, নদী ধেয়ে এসে সরোবরকে আলিঙ্গন করছে; লতানে গাছ অবলম্বনের জন্য বৃক্ষকে আশ্রয় করছে। প্রিয়তম তোমার বিরহ এসময়ে সহন করা যায় না।)

বিরহের অন্য একটি দোঁহাতে কবির যে বিচিত্র কল্পনাশক্তির পরিচয় দেখা যায় তাও যে কী অভূতপূর্ব:

প্রীতম তোরে কারণে, তাতা ভাত না খায়।
হিওড়া ভীতের প্রিয় বসৈ, দাঝবতী ডর পায়।

(প্রিয়তম তোমর জন্য আমি গরম ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি- হৃদয় জুড়ে বুকের মধ্যে তুমি বসে রয়েছ, গরম ভাত খেলে যদি তোমার গায়ে তাত লাগে, তাই আমি ভয়ে ভয়ে থাকি।

৬। প্রখ্যাত প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্কিত দোঁহা-

ঢোল-মারুবণী, বীজা-সোরাঠ এবং জৈঠবা-উজলী প্রভৃতির মতো বহু নায়ক-নায়িকা প্রেমাখ্যান প্রাচীন রাজস্থানি সাহিত্যের একটা বড়োঅংশ জুড়ে রয়েছো এইসব কাহিনীর ঐতিহাসিক যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এগুলি রূপকথার অলীক কল্পনাবিলাসও নয় । হয়তো সত্যের বীজটি মানুষের ভালোবাসায় ও সময়ের ব্যবধানে অতিরঞ্জনের শাখাপ্রশাখায কিছুটা পল্লবিত হয়েছে।এরকমই এক কাহিনী ঢোলা-মারুবাণী প্রেমগাথা।এাদে বিরহওমিলনের কাহিনী-রূপকথার অতীত এমন এক মিথ যা রাজস্থানি জনমানসে ঐশ্বরিক পর্যায়ে পৌছে গিয়েছ। এইনায়ক-নয়িকার অবস্থান সম্পর্কে একটি দোঁহা.

সোরোঠিয়ো দুহো ভলো, ভল মরবণ রী বাত।
জোবন ছাঈ ধণ ভালো, তারাঁ ছাঈ রাত।।

(সুরাঠের দোঁহা, মারুবনীর কাহিনী, যৌবনময়ী রুপসী রমণী আর তারকাখচিত আকাশ, এই সবকিছুই সকলের হৃদয় মুগ্ধ করে থাকে।)

৭। রমণীরূপের বর্ণনামূলক দোঁহা-

মানুষ সুন্দর উপাসক। সকা পৃথিবীরযাকিছু সুন্দর ও রমণীয় তা আমাদের মুগ্ধকর। রমনীয় রূপমাধুরী সেই সুন্দরের এক অপার্থিব প্রকাশ যা অনাদিকাল থেকে বিশ্বের কবিমনকে প্রভাবিত করেছে। রাজস্হানি চারণকবিরাও সে রূপবন্দনা থেকে বিরত থাকেনি :

মাকদেস উপন্নিয়া, ত্যাঁকা দন্ত সুসেত।
কূঝ বঁচা গোর গিয়া, খঞ্জন জেহা নেত।।

(এই মরুদেশের রমণীরা ক্রৌঞ্চ শাবকের মতো গৌরাঙ্গী, তাদের সুকুমার দন্তপঙ্‌ক্তি উজ্জ্বল তুষারশুভ্র এবং নয়ন খঞ্জন পাখির মতো দিঘল দেখতে হয়।)

এভাবেই শ্রেণীবিন্যাসে অন্য অধ্যায়গুলি হল :
৮। স্বদেশবন্দনা ও দেশপ্রেম স্সম্পর্কিত দোঁহা,
৯। নেশার অপকারিতা ও নীতিকথামুলক দোঁহা,
১০। দোঁহায় শাশ্বত চেতনার কিছু ভাস্বর অনুভাবনা।

এই দশম অধ্যায়ের দোঁহাগুলি ,কোনো একটি নিদিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক রচনা নয় । এই পর্বের দোঁহাগুলিতে মানবমনের ভাবনাধারার এমন বহুমূখী প্রকাশের সমুজ্জ্বল কিছু আলেখ্য টুকরো টুকরো উঠে এসেছে যা সৎভাবণা ও দর্শনের প্রগাঢ় উপলব্ধির ছোটো ছোটো হীরককণার দ্যুতিতে আমাদের মুগ্ধ হতে হয় :

ঊদা অদতারাঁ তণোঁ, জাসী নাম মিঘট্ট।
জাণ পঙ্কেরু উড়িয়ো, না লিহড়ী না বট্ট।

(কৃপণের নাম লো ভুলে যায়- তার অস্তিতের কোনো চিহ্নই থাকে না; পাখি যেমন উড়ে যাবার পর আকাশের গায়ে কোনো দাগ অথবা পদচিহ্ন রেখে যায় না।)

অথবা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয় এমন একটি দোঁহা.

পাত ঝড়তা দেখতে, হঁসী জো কূপলিয়াহঁ।।
যো বীথী তো বীতসী, ধীরী ঝপড়িয়াহঁ।।

(জীর্ণ পাতাকে ঝরে যেতে দেখে নবজাত কিশলয় হাসতে থাকে (তার হাসি দেখে ঝরাপাতা বলে) একটু সবর করো, আমার মতো এ অবস্থা তোমার একদিন হবে।)

শাশ্বত অনুভাবনার এই অনিন্দ্যসুন্দর প্রাচীন রাজস্থানি দোঁহাগুলি আমার কল্পনা ও উপলব্ধির দিগন্তকে যেন আরও একটু বিস্তৃত করে তোলে। রাজস্থানের এই অজ্ঞাতনামা চারণকবিদের কাছে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথনত হয়ে আসে।

তথ্যসূত্র

এই নিবন্ধের তথ্য ও তত্ত্ব নীর্বাচিত রাজস্থানি দোঁহা – জ্যোতির্ময় দাশ (প্রকাশক – সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্ল, ২০০০ খ্র.) –এর গ্রন্থটি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের মূল গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ জানাই।